ঋষিকুমার

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

ঋষিকুমার

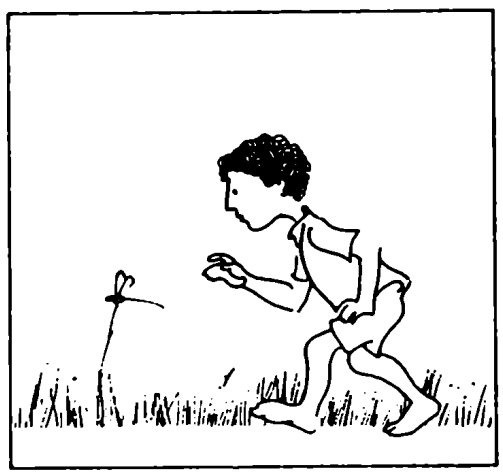

ঋষিকুমার

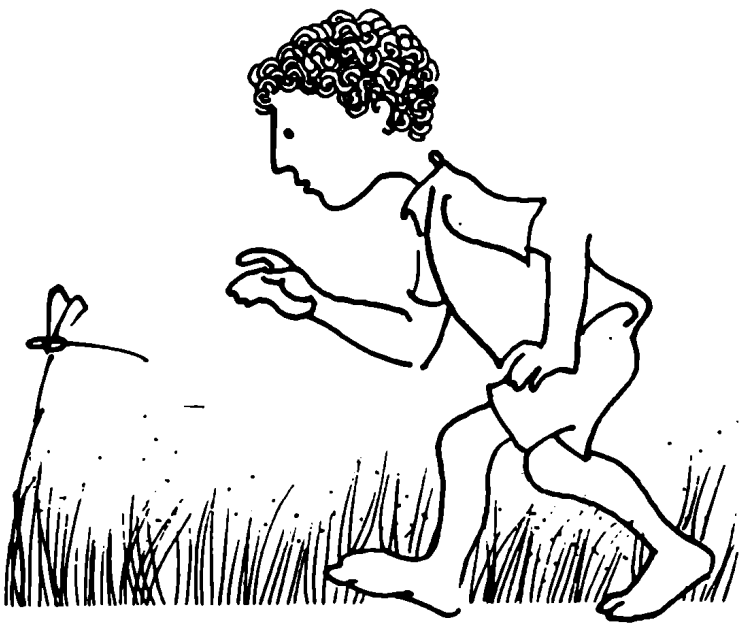

১

আকাশে মস্ত-মস্ত কালো মেঘের চাঁই, থেকে-থেকে রাগে গরগর করছে। মাঠ থেকে যে যার গরু নিয়ে চলে গেছে, কেবল একটা মাঝবয়সী বাছুর কে বেঁধে রেখে গেছে, মেঘের গর্জন শুনে খুব হাম্বা-হাম্বা করে সে তার মাকে ডাকছে।

ঋষি একমনে ফড়িং ধরছিল। ঘন-ঘন হাম্বা শুনে ভুরু কোঁচকাল। এত চেঁচামেচিতে কখনও ফড়িং ধরা যায়! যা চালাক এগুলো। বাছুরটার কাছে গিয়ে বলল, 'কে রে বেঁধে রেখেছে? গুঁতোতেও তো শিখিসনি— যা ছোট্ট শিং। ভাগ—' বলে খোঁটাসুদ্ধ উপড়ে বাছুরের ল্যাজে পাক দিয়ে ছেড়ে দিল।

বড় একটা ফড়িং সরু চোরকাঁটার ডগায় এসে বসতেই চোরকাঁটাটা ফড়িঙের ভারে দুলতে লাগল। কী রং ফড়িংটার! ঠিক বিদেশি ডাকটিকিটের মতো। ঋষি এক হাত দূরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। নিশ্বাস বন্ধ করে একটু একটু করে ডান হাত বাড়াতে থাকল। তার হাতের

আঙুল যখন ফড়িঙের ল্যাজ থেকে মাত্র ইঞ্চি-তিনেক দূরে, ফড়িংটাও কিছু টের পায়নি, খপ্ করে ধরলেই হয়, ঠিক সেই সময় তার বাড়ানো আঙুলের ডগায় আরেকটা ফড়িং এসে বসতেই সে চমকে নড়ে উঠল। দুটো ফড়িংই সুড়ুৎ করে দূরে উড়ে গিয়ে শূন্যে স্থির হয়ে ভাসতে লাগল।

উত্তেজনায় চোখ সরু করে ঋষি কয়েক মুহূর্ত দেখল ফড়িং দুটোকে। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে ফড়িং দুটোর খুব কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে লাগল, এত আস্তে যে দেখে মনেই হয় না সে উঠে দাঁড়াচ্ছে। খানিকটা উঠেছে, ফড়িং দুটো তেমনই ভেসে রয়েছে, একটা ফড়িং সামান্য ল্যাজ তিরতির করে আবার স্থির হয়ে গেল, ঋষি দম বন্ধ করে আছে, আরেকটু উঠে দাঁড়ালেই একটা ফড়িং ধরা যায়— এমন সময় প্রচণ্ড জোরে মেঘ ডেকে উঠতেই দুটো ফড়িংই এঁকে-বেঁকে মাঠের কিনারের দিকে উড়ে গেল।

ঋষি রেগে আকাশে মুখ তুলে চেঁচিয়ে বলল, 'কে চেঁচাল? অনেকক্ষণ থেকে তোমাদের ঝগড়া শুনছি। পৃথিবীর মানুষদের কি কাজকম্ম নেই? নির্বোধ!'

'নির্বোধ' কথাটি ঋষি শিখেছে তাদের নতুন ক্যাশিয়ারের কাছে। কর্মচারীরা টাকা নেবার সময় ঠিকমতো সই করতে, কি বুড়ো আঙুলের ছাপ দিতে

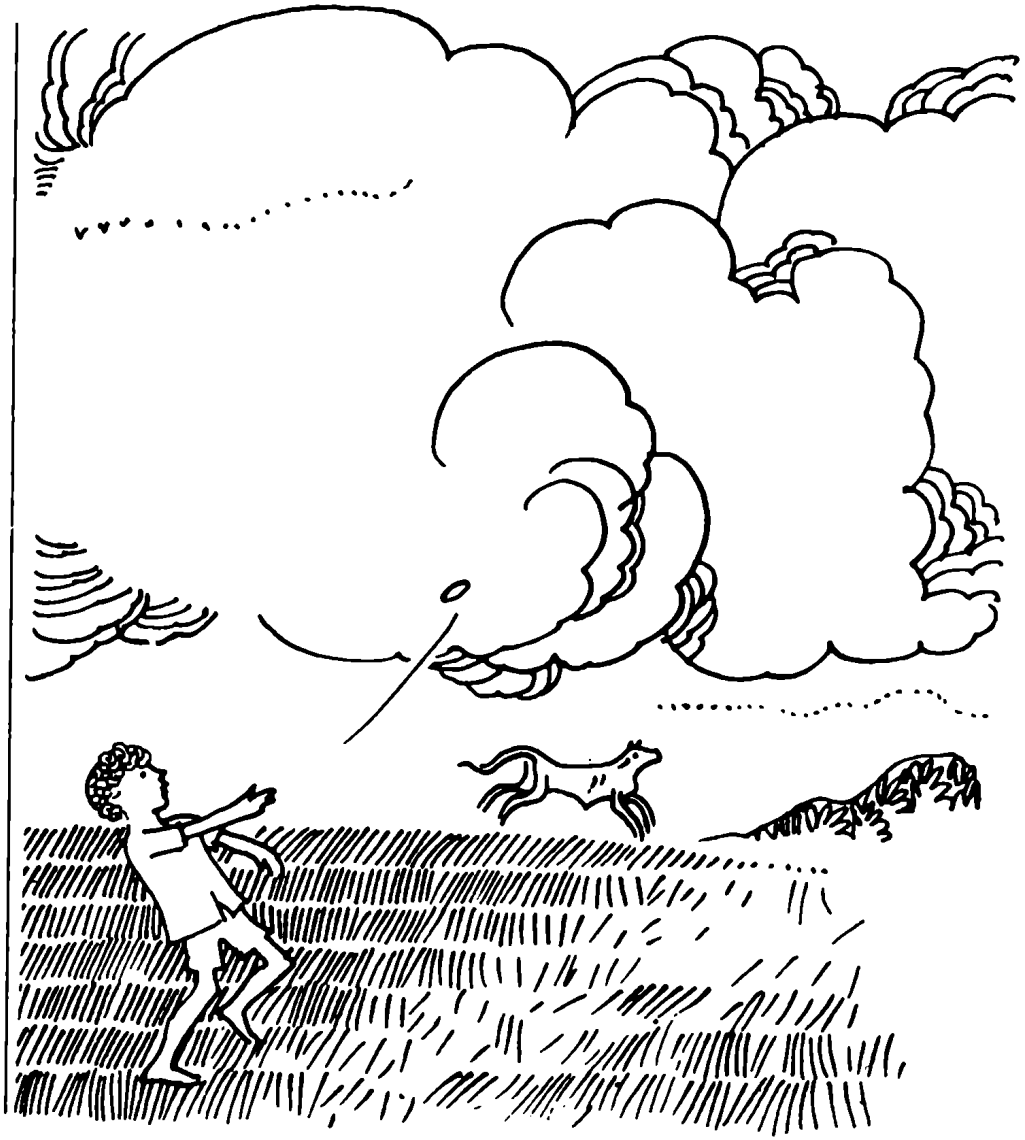

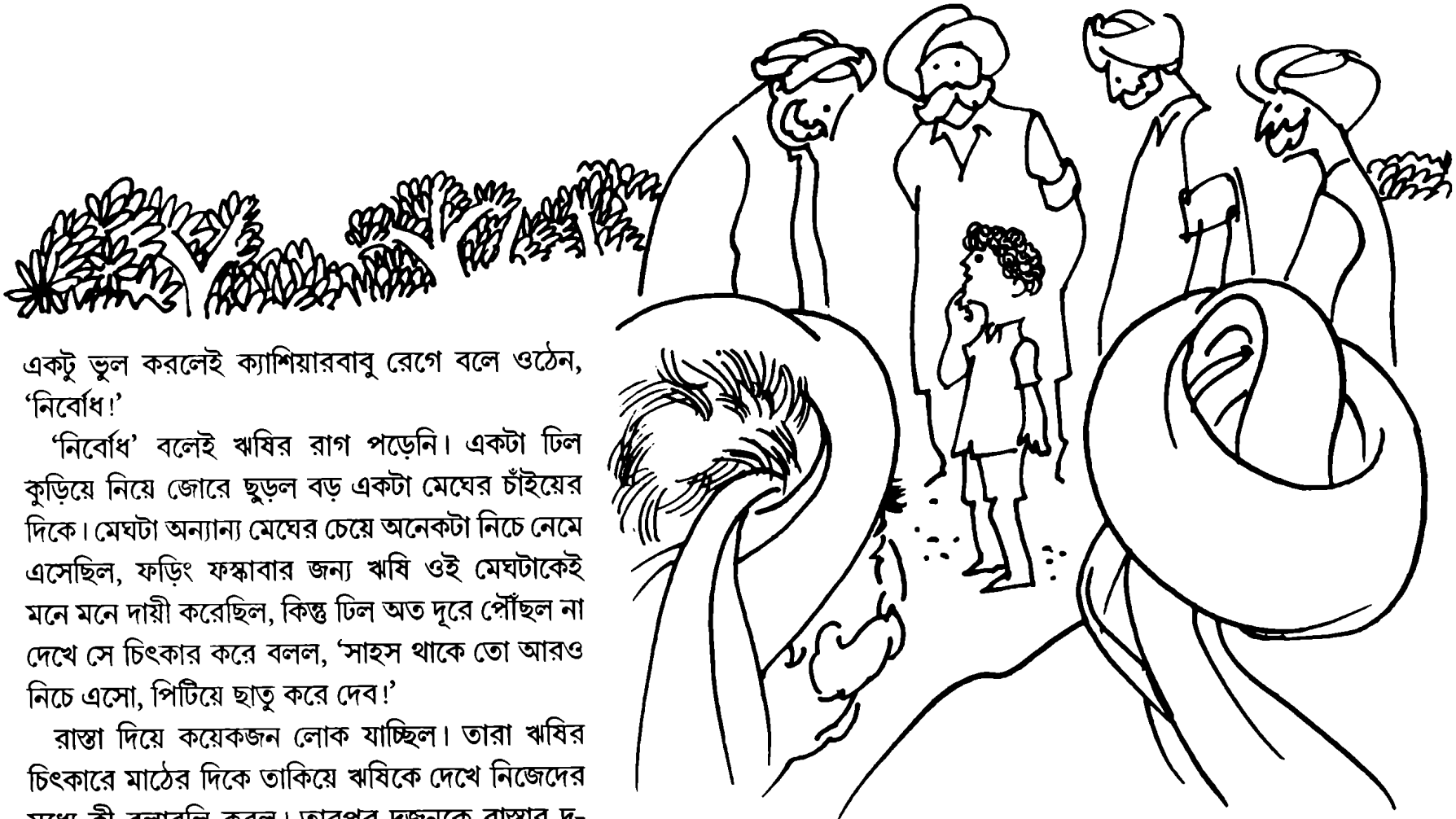

একটু ভুল করলেই ক্যাশিয়ারবাবু রেগে বলে ওঠেন, 'নির্বোধ!'

'নির্বোধ' বলেই ঋষির রাগ পড়েনি। একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে জোরে ছুড়ল বড় একটা মেঘের চাঁইয়ের দিকে। মেঘটা অন্যান্য মেঘের চেয়ে অনেকটা নিচে নেমে এসেছিল, ফড়িং ফস্কাবার জন্য ঋষি ওই মেঘটাকেই মনে মনে দায়ী করেছিল, কিন্তু ঢিল অত দূরে পৌঁছল না দেখে সে চিৎকার করে বলল, 'সাহস থাকে তো আরও নিচে এসো, পিটিয়ে ছাতু করে দেব!'

রাস্তা দিয়ে কয়েকজন লোক যাচ্ছিল। তারা ঋষির চিৎকারে মাঠের দিকে তাকিয়ে ঋষিকে দেখে নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করল। তারপর দুজনকে রাস্তার দু-

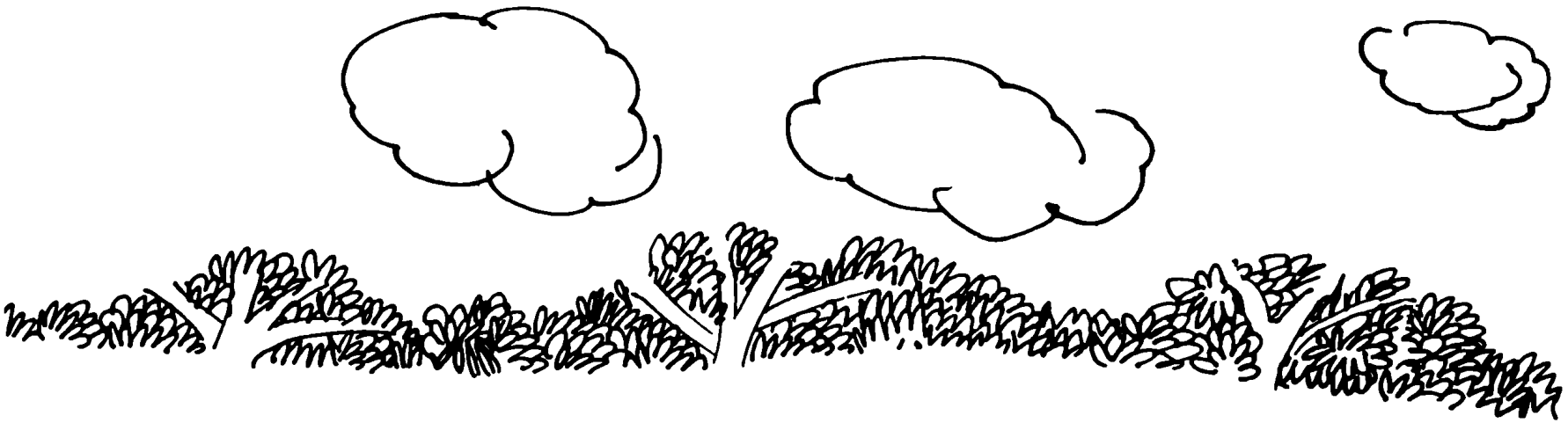

মুখে দাঁড় করিয়ে রেখে বাকি ছজন হনহন করে মাঠের মাঝখানে এসে ঋষিকে ঘিরে ফেলল। চেহারা দেখে সবাইকে বাঙালি মনে হয় না, কয়েকজন মাথায় অনেক লম্বা, কালো বেড়ালের ল্যাজের মতো লম্বা গোঁফ, চওড়া গালপাট্টা, চোখ লাল, মজবুত চেহারা। তাদের মধ্যে একজন ঋষিকে বাংলায় বলল, 'তোর সঙ্গে এখানে আর কে ছিল? কার সঙ্গে কথা বলছিলি?'

ঋষি এতক্ষণ ওদের দেখছিল। কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'তোমরা কি চম্বলের ডাকাত?'

আরেকজন চারদিকে চোখ বোলাচ্ছিল, বাঁ-হাতে ঋষির মুখটা তুলে ধরে বলল, 'তোমার বাবা আমাদের পাঠিয়েছে। তোমার জন্য একটা বড় বন্দুক কিনে এনেছে। চলো, দেখবে চলো।'

'আমার বন্দুক আছে। তোমরা কি চম্বলের ডাকাত?'

লোকটা কী বলতে যাচ্ছিল, আরেকটা লোক তাকে থামিয়ে হিন্দিতে বলে উঠল, 'জাদা বাত মাত করো। জাদা ওয়াক্ত হ্যায় কেয়া?' তারপর ঋষিকে বলল, 'চলো, জলদি চলো, আও।'

'আমি এখন বাড়ি যাব না। বলো না, তোমরা কি চম্বলের ডাকাত?'

চতুর্থ লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছো, আমরা চম্বল থেকেই আসছি।'

লোকটা যখন 'চম্বল' কথাটা উচ্চারণ করল ঠিক তখনই খুব জোরে একবার মেঘ ডেকে উঠল আর বিদ্যুতের একটা আঁকা-বাঁকা রেখা আকাশের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত সাপের মতো হিলহিল করে দৌড়ে

গেল।

ঋষির তখন মেঘে মন ছিল না, বলল, 'খুব ভালো হল। আমি অনেকদিন থেকে তোমাদের কথা ভাবছি। আচ্ছা, চম্বলে কি খুব পাহাড়-টাহাড় আছে? আর বড় বড় শুকনো নালা? পুলিশ তোমাদের ধরতে এলে তোমরা কি সেই নালায় লুকিয়ে থেকে বন্দুক নিয়ে লড়াই করো?'

'ঠিক, ঠিক।'

'আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে— তোমাদের ডেরায়?'

যে লোকটা হিন্দিতে কথা বলেছিল, তার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি। এক পাশের গোঁফ বেড়ালের ল্যাজ আছড়ানোর মতো দুলিয়ে লোকটা বলল, 'আমরা তো তোমাকেই খুঁজছি। আও, আও।' বলে সে ঋষির হাত ধরে টান দিল।

লোকগুলোর সঙ্গে মাঠ পেরিয়ে যেতে-যেতে ঋষি শুনল, কোন রাস্তা দিয়ে কীভাবে তাকে স্টেশনে নিয়ে যাবে তাই নিয়ে ওরা চাপা গলায় হিন্দিতে বলাবলি করছে। হিন্দি না জানলেও কথা শুনে ঋষি মোটামুটি বুঝতে পারে। ওরা মাঝে মাঝে সতর্ক হয়ে এদিক-ওদিক দেখছে আর খুব বেশি চাপা গলায় কথা বলছে। ওরা কিনা চম্বলের ডাকাত, তাই হয়তো ওরকম।

সত্যিই চম্বলের ডাকাতদের সঙ্গে চম্বলে যাচ্ছে ভেবে

ঋষি মশগুল হয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকে। রাস্তায় পৌঁছে লোকগুলো রাস্তার লোক দুটোর সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছে, হঠাৎ ঋষি বলে উঠল, 'চম্বলে খুব বন আছে?'

ওদের মধ্যে একটা বেঁটে লোক ছিল, তার বাঁ-গালে মস্ত কাটার দাগ, সে বলল, 'বড়-বড় বন আছে।'

'বনে হরিণ আছে? দেখা যায়?'

'অনেক হরিণ আছে, আমরা রোজই হরিণ মারি।'

ঋষি অবাক হয়ে বলল, 'মারো? কেন?'

বেঁটে লোকটার গালের কাটা দাগ হাসিতে কিলবিল করে উঠল, বলল, 'মেরে, মশলা দিয়ে আচ্ছাসে রেঁধে, মজাসে খাই।'

'ইস্!' ভীষণ কষ্টে বলে উঠল ঋষি, 'আমি যাব না, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না।' বলে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। পিছন থেকে দুজন দৌড়ে এসে একজন হাতের থাবায় ঋষির মুখ চেপে ধরল, আরেকজন তার হাত ধরতে গেল। ঋষি হাত সরিয়ে নিয়ে দু-হাতের প্রচণ্ড ঝটকায় তার মুখের ওপর থেকে লোকটার হাত খসিয়ে দিয়ে ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'সাবধান। যারা হরিণ মারে তারা যেন আমাকে না ছোঁয়।'

'ছোঁয়' কথাটা মুখ থেকে ঠিকমতো বেরুল না, তার আগেই আরেকটা লোক এসে ঋষির নাকে-মুখে রুমাল

চেপে ধরল, অন্যরা তাকে শক্ত করে জাপটে ধরে রইল। একটা লোক দু-হাত ছেড়ে শিস দিতে দিতে সাইকেল চালিয়ে আসছিল, এই দৃশ্য দেখে শিস ভুলে সাইকেলের হ্যান্ডেল চেপে ধরে গতি বাড়িয়ে চলে গেল।

রুমালে কড়া ওষুধের গন্ধ পাচ্ছিল ঋষি। লোকগুলো তাকে এত জোরে জাপটে ধরেছিল যে তার একটুও নড়বার উপায় ছিল না। আশ্চর্যের ব্যাপার, তার খুব ঘুম পাচ্ছে। একটু পরেই ঋষি ঘুমিয়ে পড়ল।

ট্রেনের শব্দ ও ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙতেই ঋষি প্রথমে খুব অবাক হল। তারপর নিজের হাত, পা ও মুখ বাঁধা দেখে তার চম্বলের ডাকাতগুলোর কথা মনে পড়ল, বুঝল সে খুব বিপদে পড়েছে। হাত-পায়ের বাঁধুনির জায়গাগুলো ব্যথায় টনটন করছে, সারা গা ঘামে ভেজা, ঋষি বুঝতে পারল তাকে চটের থলেতে পুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

লোকজনের কথা শুনে ঋষি বুঝল কামরায় অনেক লোক রয়েছে, সেও প্রাণপণে কথা বলতে চাইল, মুখ দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরুল না। হাত-পায়ের বাঁধনও এত শক্ত যে খোলবার চেষ্টা করতে গিয়ে তার ব্যথা আরও টাটিয়ে উঠল। তখন সে শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে কামরার দেওয়ালে জোড় পায়ে ধাক্কা মারতে মারতে খানিকটা সরে এল। ঠিক কোথায় সে রয়েছে

আর কোন দিকে সরছে সে বুঝতে পারল না। সে কি সীটের নিচে রয়েছে, না বাঙ্কের ওপর?

বাঙ্কের ওপর থাকলে নিচে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। সে যতটা পারে নড়বার চেষ্টা করতে লাগল, শুয়ে শুয়েই এপাশ-ওপাশ গড়াগড়ি দিতে লাগল।

মুখবাঁধা একটা বস্তাকে অত নড়াচড়া করতে দেখে কামরার কয়েকজনের মনে সন্দেহ হল। 'কার বস্তা এটা', 'কী আছে এতে', 'ভারি ভুতুড়ে ব্যাপার তো' — এইসব বলে তারা চেঁচামেচি শুরু করে দিল। সারা কামরার লোক তাই শুনে 'কী ব্যাপার', 'কই, কোথায়', 'কী হয়েছে' বলতে বলতে বস্তার কাছে ভিড় করে এল। কয়েকজন হাত লাগিয়ে বস্তার মুখ খুলে দিতেই ঋষি দেখল সেই ডাকাতদের একজন চলন্ত ট্রেনের দরজার হাতল ধরে বাইরের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে না-কি! লোকেরা ঋষির বাঁধন খুলে দিতেই সে চিৎকার করে দরজায় দাঁড়ানো ডাকাতটাকে দেখিয়ে বলল, 'ধরো, ধরো, চম্বলের ডাকাত!'

ট্রেন এত জোরে ছুটছে যে লোকটা লাফ দিতে গিয়েও পারল না। অনেকে মিলে তাকে জাপটে ধরে ভেতরে নিয়ে এল। ডাকাতরা ঋষিকে যেসব দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল, তাই দিয়ে ডাকাতটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হল। ঋষি সারা কামরা তন্নতন্ন করে খুঁজেও বাকি ডাকাতদের

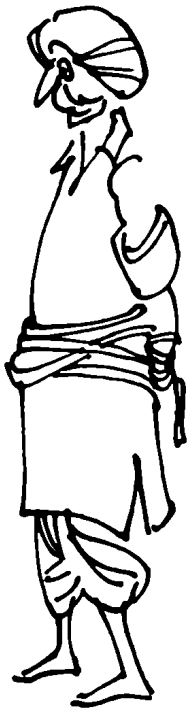

দেখতে পেল না। তারা দলের একজনকে বস্তার ওপর চোখ রাখবার জন্য এই কামরায় রেখে নিজেরা ভাগ-ভাগ হয়ে অন্যান্য কামরায় গিয়ে বসেছিল, যাতে কেউ না সন্দেহ করতে পারে।

'মোট আটজন ছিল, আটজন! কারো কাছে কি একটা বন্দুক আছে?' বলে ঋষি এর-ওর দিকে তাকাল।

শাদা দাড়ি, শাদা চুল, এক বৃদ্ধ জানলার কাছে বসে মোটা একটা বই পড়ছিলেন, ডাকাতটাকে যখন বাঁধা হচ্ছে তখন তাঁর হুঁশ হল ট্রেনের কামরায় কী-একটা গোলমাল চলছে, তারপর থেকেই বই মুড়ে রেখে তিনি সব শুনছিলেন, ঋষির কাছে এসে বললেন, 'বন্দুক দরকার নেই। ওরা এতক্ষণে পালিয়েছে। তোমার নাম কী?'

'ঋষিকুমার চৌধুরী।'

আরেকজন বলল, 'চম্বলের ডাকাত, তুমি জানলে কী করে?'

'না তো কী! ওরাই বলেছে।'

একজন শার্ট-প্যান্টপরা যুবক, চোখে হালকা নীল চশমা, ঋষিকে জিজ্ঞেস করল, 'চম্বলের ডাকাতরা তোমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছিল কেন?'

ঋষি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওরা কেন ধরবে, আমিই ওদের সঙ্গে যাচ্ছিলাম। ওরা হরিণ মারে শুনে

আমি যাব না ঠিক করলাম। তখন ওরা আমাকে নাকে ওষুধ শুঁকিয়ে ঘুম পাড়িয়ে জোর করে নিয়ে যাচ্ছিল।'

একজন চানাচুরওয়ালা চোখ বড় বড় করে ঋষির কথা শুনছিল, ঋষি তাকে বলল, 'আমার কাছে পয়সা নেই, তুমি ঠিকানা দিলে আমি তোমাকে বাড়ি ফিরে পয়সা পাঠিয়ে দেব, এখন আমাকে পাঁচ প্যাকেট চানাচুর দাও।'

শুনে লোকেরা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'সে কী কথা! তুমি কেন পয়সা দেবে! পয়সা আমরা সবাই মিলে দিচ্ছি। তুমি যত খুশি চানাচুর খাও। পাঁচ প্যাকেট খেতে পারবে?'

'ডাকাতরা তো কিছু খেতে দেয়নি, আমার খিদে পেয়েছে।'

'আহা রে, তাই তো', বলে একজন মহিলা তাঁর টিফিন ক্যারিয়ার থেকে লুচি, আলুর দম আর দুটো সন্দেশ একটা ডিশে সাজিয়ে ঋষিকে দিয়ে বললেন, 'খাও। তোমার মা না-জানি কত ভাবছেন! তোমাকে একটু চোখে চোখে রাখেন না কেন বুঝি না।'

খেতে খেতে ঋষি বলল, 'মা তো এখনও জানেই না, চম্বলের ডাকাতরা আমাকে হাত-পা বেঁধে বস্তায় পুরে নিয়ে যাচ্ছিল।'

একটু পরে, খাওয়া শেষ করে ঋষি বলল, 'এবার চানাচুর দাও, পাঁচ প্যাকেট।'

শুনে সেই মহিলাটি বললেন, 'অত চানাচুর খাওয়া কি ভালো? তুমি আর-কটা লুচি খাও, সন্দেশ দেব আর দুটো?'

তাঁর ছেলেটা, ঋষিরই বয়েসী, পাশ থেকে নিচু গলায় বলল, 'আমার ভাগেরটা ওকে দাও না মা।' মহিলাটি ঋষিকে বললেন, 'কী দেব— সন্দেশ, না আলুর দম?'

'ও আর খাব না। চানাচুরের প্যাকেটের রংটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, আরশোলার পাখনার মতো।'

ঋষি বসে বসে চানাচুর খাচ্ছে, আর লোকেদের একথা-ওকথার উত্তর দিচ্ছে, এমন সময় বুড়ো একটা লোক, সে বাঁকে করে ডাব নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল, ঋষির কাছে এসে বলল, 'ডাব খাবা?'

'ইস্! ঠিক টিয়াপাখির মতো রং।'

'তুমি খাবা? পয়সা লাগব না।'

'না, ডাব কাটলে দেখতে ভালো লাগে না।'

অন্য একজন বলল, 'তুমি চানাচুর খেয়ে পেট ভরাচ্ছো কেন? খড়্গাপুরে নেমে কত ভালো-ভালো খাবার পাবে। আর পুলিশ তোমাকে কত টাকা পুরস্কার দেয় দেখো। একেবারে জ্যান্ত চম্বলের ডাকাত ধরা পড়ল তোমারই জন্য, এ কি সামান্য কথা! হয়তো আমাদেরও কিছু দেবে।'

দড়ি-বাঁধা লোকটা হঠাৎ ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেলে

বলল, 'আমি চম্বলের ডাকাত-টাকাত নই বাবু, চম্বল কোথায় আমি তা-ই জানি না। আমি গরিব মানুষ, আমাকে ছেড়ে দিন বাবু।'

'তুমি ডাকাতদের সঙ্গে এই ছেলেটাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলে না? ও তোমাকে চিনল কী করে?'

'আমি শুধু ওদের সঙ্গে ছিলুম বাবু। ওরা আমাকে ছেলেধরার তালিম দিচ্ছিল। ওরা এই গাড়িতেই আছে, ওদের পুলিশে দিন বাবু, আমাকে ছেড়ে দিন।'

'ওদের ধরবার ব্যবস্থা ট্রেন থামলেই হবে। তুমিও এসব কথা পুলিশের কাছেই বোলো।'

ঋষি তখনও চানাচুর খাচ্ছিল, লোকটার কথায় খাওয়া থামিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, 'তোমরা চম্বলের ডাকাত নও?'

'না বাবু। এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি।'

বলে লোকটা বাঁধা হাত দুটোই একটু বাড়াবার চেষ্টা করল।

ঋষি চানাচুর খেতে ভুলে গেল। কোনও কথা না বলে সে জানলা দিয়ে বাইরের দিয়ে চেয়ে রইল।

খড়্গপুরে ট্রেন থামতেই কয়েকজন নেমে গেল পুলিশকে খবর দিতে। যাদের ওখানেই নামবার কথা তারাও সঙ্গে গেল।

রেলের পুলিশ হাত-পা বাঁধা লোকটার কোমরে দড়ি বেঁধে, হাতকড়া পরিয়ে আগের বাঁধন খুলে দিল। তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে আশপাশের কামরা থেকে বাকি লোকগুলোকেও ধরে ফেলল, একজন শুধু দরজা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে পালিয়ে গেল।

কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া পরা লোকগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে রাইফেল হাতে পুলিশ, আর সামনে মস্ত বড় একটা টেবিলে মাথা ঝুঁকিয়ে একজন পুলিশ অফিসার কী সব লিখছেন আর মাঝে মাঝে লোকগুলোকে প্রশ্ন করছেন।

ঋষিকে একটা চেয়ারে বসানো হয়েছিল। বসে বসে তার হাই উঠতে লাগল। চেয়ারে পিঠ হেলিয়ে সে ইলেক্ট্রিক ট্রেনের তার দেখতে লাগল। আকাশের গায়ে খাতার রুলিংয়ের মতো লম্বা টানা তারগুলো নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে দিল্লি বা বম্বে বা চম্বল পর্যন্ত চলে গেছে!

তারের ব্যাপারটা নিয়ে ঋষি খানিকক্ষণ ভাবতে লাগল। কলকাতা থেকে দিল্লি— কত লম্বা তার তাহলে? আর, কতগুলো পোস্ট? আচ্ছা, চম্বল জায়গাটা ঠিক কোথায়? চম্বলের ডাকাত কখনও ভেউ-ভেউ করে কাঁদে না!

এইসব ভাবছে, এমন সময় ঋষি দেখল, তারের ওপর দিয়ে একফালি সবুজের মতো টিয়ার ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে।

পুলিশ অফিসার তখনও লিখছেন, ঋষি হঠাৎ তাঁকে

জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, মানুষ এরোপ্লেন বানাতে পারে, কিন্তু পাখির মতো একা-একা উড়তে পারে না কেন? অথচ পাখিরা তো একটা পেনসিলও তৈরি করতে জানে না।'

অফিসারটি লেখা থামিয়ে হাতের পেনসিলটা দু-আঙুলে দোলাচ্ছিলেন, খানিকক্ষণ ঋষির দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'তোমার বাবার নাম শ্রী প্রভাতকুমার চৌধুরী?'

ঋষি বলল, 'হুঁ।' তারপর ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে ঠিকানা বলল, তারপর একটা পুলিশের হাতের রাইফেল দেখিয়ে বলল, 'এরকম বন্দুক কোথায় কিনতে পাওয়া যায়?'

অফিসারটি এবার হেসে ফেলে বললেন, 'তোমার চাই একটা? আচ্ছা, আমি প্রধানমন্ত্রীকে তোমার কথা লিখছি, তিনি যদি তোমাকে এরকম একটা বন্দুক দিতে রাজি হন, আমি তোমার বাড়ি গিয়ে তোমাকে দিয়ে আসব। এখন তুমি কী চাও বলো। তুমি যেরকম সাহস দেখিয়েছ, তোমাকে আমরা পুরস্কার দিতে চাই। তুমি শুনে নিশ্চয়ই খুশি হবে, এই ছেলেধরার দলটাকে আমরা অনেকদিন থেকে ধরবার চেষ্টা করছিলাম। কী চাও বলো।'

'আমি পুলিশের জিপগাড়িতে চড়ে এখান থেকে বাড়ি যেতে চাই।'

'ব্যস্? আর কিছু না? আরও কিছু চাও।'

'আর— একটা তীরধনুক চাই, সত্যিকারের

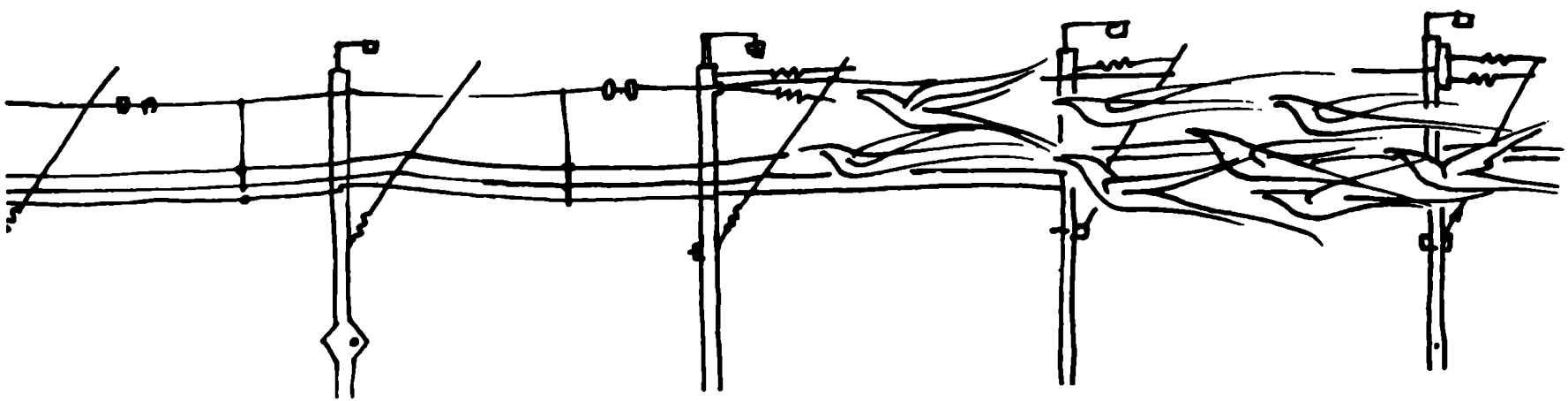

তীরধনুক, যেমন সাঁওতালদের থাকে।'

'বেশ, জিপে করে তোমাকে এক্ষুনি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে। আর সাঁওতালদের তীরধনুকের মতো তীরধনুক মিস্ত্রি দিয়ে আমি তোমাকে বানিয়ে দেব, কেবল তীরটা সত্যিকার দিতে পারব না। খুশি?'

'তীরধনুক চাই না।'

'বাব্বা! তোমার তো খুব অভিমান। এই তো চাই!' বলে মৃদু হেসে পুলিশ অফিসার হাতঘড়ি দেখলেন। তারপর ছোট্ট ট্রানজিস্টর রেডিওটা চালিয়ে দিয়ে সিগারেট ধরালেন। ঋষি শুনল, পূর্ণদাস বাউলের গান হচ্ছে। ঋষি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, একটু পরে গান শেষ হতেই বলল, 'বাউলদের সঙ্গে পাখির খুব মিল রয়েছে। যদি পারি, আমি বড় হয়ে বাউল হব।'

ঠিক সেই সময় রেডিওয় শোনা গেল— ঋষিকুমার চৌধুরী, বয়স আট, হালকা-পাতলা গড়ন, ফর্সা, সুন্দর মুখশ্রী, থুতনির নিচে কাটা দাগ, বুদ্ধিমান, কল্প-জগতের বাসিন্দা— গতকাল দুপুর থেকে নিরুদ্দেশ। যাঁরা খবর পাবেন তাঁরা লালবাজারে ....

কথা শেষ হবার আগেই ঋষি বলে উঠল, 'বাঃ! খুব মজা তো! আচ্ছা, কল্প-জগতের বাসিন্দা মানে কী?'

সিগারেটে টান দিয়ে অফিসারটি বললেন, 'কল্প-জগতের বাসিন্দা মানে যারা পাখি বা বাউল হতে চায়।

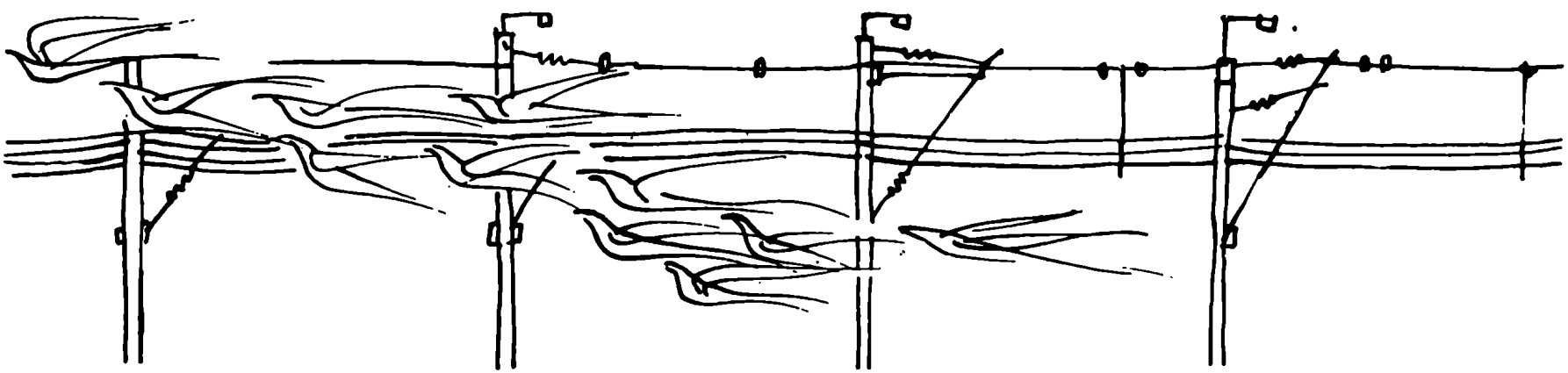

তোমার কথা কালকের রেডিওতেও বলেছিল। একটু আগেই লালবাজারে তোমার খবর পাঠিয়েছি, রেডিওয় এখনও পৌঁছয়নি দেখছি।'

একটু পরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমার জিপ রেডি। দত্ত, তুমি সঙ্গে যাবে। কিছু স্যান্ডউইচ, ফিশফ্রাই, অ্যাপল-ট্যাপল নিয়ে নিও।'

শেষ কথাগুলো কোমরের বেলটে রিভলবার লাগানো একজন ফিটফাট পুলিশকে বলে তিনি ঋষির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন।

জিপে দত্তর পাশে পিঠ সোজা করে বসে রইল ঋষি। গাড়ির ঝাঁকুনিতে দত্তর কোমরের সত্যিকার রিভলবারটা মাঝে মাঝেই তার গা ছুঁয়ে যাচ্ছে, ঋষি গম্ভীর, টানটান হয়ে বসে আছে। বসে-বসে এক সময় তার মাথাটা দত্তর কাঁধে ঢুলে পড়তে লাগল, বারবার তার পিঠ কুঁজো হয়ে এল, দত্ত আস্তে করে ঋষির মাথা নিজের কোলে নামিয়ে রাখল।

বাড়ি পৌঁছেও ঋষির ঘুম ভাঙল না। বাবা চেষ্টা করলেন, মা চেষ্টা করলেন, ঋষি ঘুমে কাদা। আশপাশের বাড়ি থেকে যারা ঋষিকে দেখবার জন্য সন্ধে থেকে অপেক্ষা করছিল, তারাও কেউ কেউ ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করল, কিন্তু অত চেঁচামেচি, নাড়াচাড়ায় তার ঘুমের কোনও বিঘ্ন হল না।

ঋষির বাবা তার হাতের নাড়ি ধরে দত্তর দিকে চেয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার? অসুস্থ হয়নি তো?'

দত্ত হেসে বলল, 'ওকে নিয়ে ভাববেন না। চম্বলের ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করে একটু ক্লান্ত হয়েছে হয়তো। আমরা খাইয়ে দিয়েছি, কাল সকালে উঠলে ওর মুখে ওর চম্বল অভিযানের কাহিনী শুনবেন। চলি, নমস্কার।'

দুশ্চিন্তায় ঋষির মায়ের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। তিনি ঋষিকে কোলে করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তার কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিতে-দিতে বললেন, 'এই ছেলে এত কাণ্ড করতে পারে, বিশ্বাস হয়?'

ঋষির বাবা গম্ভীর মুখে পায়চারি করছিলেন, বললেন, 'এবার থেকে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করতে হবে।'

ঋষিকে দুধ খাওয়াবার জন্য আরেকবার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করা হল, সে শুধু বিড়বিড় করে বলল, 'আচ্ছা, তোমাদের গোঁফে ছারপোকা হয় না?'

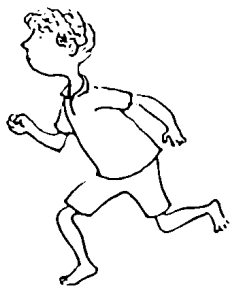

২

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ঋষি মাকে বলল, 'মা, এই দুদিন আমার চিড়িয়াখানায় ঠিকমতো খাবার দেওয়া হয়েছিল?'

ঋষির মা ঋষির কথা ভেবেই পাগল হয়ে ছিলেন, ফড়িং-চামচিকের খাবার দেবার কথা তাঁর মনে ছিল না, বললেন, 'তারা কি আর উপোস করে আছে? বিপিনের মা নিশ্চয়ই খেতে দিয়েছে।'

ঋষি একদৌড়ে ছাদে চলে এল। এক কোণের কার্নিশ ঘেঁসে ইট-কাঠ দিয়ে তৈরি কতগুলো ছোট-ছোট খুপরি। একটা খুপরিতে চামচিকে, একটায় ফড়িং, একটায় আরশোলা, একটায় উচ্চিংড়ে, একটা খুপরিতে কয়েকটা গঙ্গাফড়িংও আছে।

আরেকটা খুপরিতে খাঁচার মধ্যে একটা শালিখছানা।

ঋষির বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। শালিখছানাটা মরে খাঁচার কোণে চিৎ হয়ে পড়ে আছে, কচি-কচি পা-দুটো কুঁকড়ে পেটের সঙ্গে লেগে রয়েছে।

দমকা হাওয়ায় শুকনো পাতা যেমন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছিটকে গিয়ে পড়ে, ঋষি প্রায় সেইভাবে তার মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার মা

খবরের কাগজ পড়ছিলেন, ঋষি বলে উঠল, 'মা! দুদিন নিশ্চয়ই চিড়িয়াখানায় খাবার দেওয়া হয়নি। আমার শালিখছানা কেমন করে মরে পড়ে আছে দেখে এসো। উঃ! তোমরা কী নিষ্ঠুর!'

কাগজ থেকে চোখ তুলে ঋষির মা দেখলেন, ঋষির চোখে জল। বললেন, 'ছি, ঋষি, অবুঝ হোসনি। তুই কোথায় আছিস, তোকে কে খাওয়ায় ভেবে ভেবে এ দুদিন আমার মাথার ঠিক ছিল না, তখন তোর ওই আরশোলা আর পাখিকে খাওয়াবার কথা মনে থাকে? তুই-ই বল।'

'আমাকে ট্রেনের লোকেরা খাইয়েছে, পুলিশ পর্যন্ত আমাকে খেতে দিয়েছে, আর তোমরা আমার প্রাণী-কটাকে খেতে দেবার কথা ভুলে গেলে!'

জামার হাতায় চোখ মুছে ঋষি ছাদে উঠে এসে মরা শালিখছানাটা আলতো করে দু-হাতে তুলে নিল। বাড়ির পিছন দিকে ফুলের বাগান, তার মায়ের হাতের তৈরি। সেই বাগানের এককোণে গর্ত খুঁড়ে ঋষি শালিখছানাটাকে গর্তের ভেতর শুইয়ে দিল। তারপর গর্তের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পাখির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। তার দুই চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছিল, সে তেমনই পাখির চোখে চোখ রেখে খুব আস্তে উচ্চারণ করল, 'পাখি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।'

তারপর সেই ছোট্ট পাখির ছোট্ট কবরে মাটি দিয়ে তার ওপর ছোট্ট একটা ফুলের চারা পুঁতে দিল।

সমস্ত বাগানে ধুলোর মতো বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টির কণা ডানায় মেখে কোত্থেকে দুটো শালিখ উড়ে এসে ঋষির মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে গলা চিরে চ্যাঁ-চ্যাঁ করতে লাগল। ঋষি মুখ তুলে শালিখ দুটোকে দেখল। তারপর কী ভেবে ছাদে গিয়ে তার চিড়িয়াখানার সব দরজা খুলে দিল। ফড়িং, চামচিকে, গঙ্গাফড়িং যে যেখানে ছিল হঠাৎ ছাড়া পেয়ে মেঘলা আকাশের নিচে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে চিরিক-চিরিক করে নেচে বেড়াতে লাগল।

'ঋষি, ও ঋষি, তুই কোথায়? স্কুলের যে বেলা হয়ে গেল!' বলতে বলতে তার মা ছাদে এসে দেখেন, আকাশের দিকে চেয়ে ঋষি চুপ করে বৃষ্টির মধ্যে বসে আছে।

'ওমা, তুই এখানে! এমন করলে যে জ্বরে পড়বি বাবা। আয়— ওঠ', বলে ঋষির মা তার হাত ধরতেই ঋষি মায়ের মুখের দিকে চেয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

'সে কী রে, কাঁদছিস কেন? কী হয়েছে?' বলতে বলতে মা তাকে বৃষ্টি থেকে সরিয়ে সিঁড়ির মুখে নিয়ে এলেন। 'কই দেখি, মুখখানা দেখি একবার,' বলে একহাতে ঋষির কান্না-ভেজা মুখ তুলে ধরলেন।

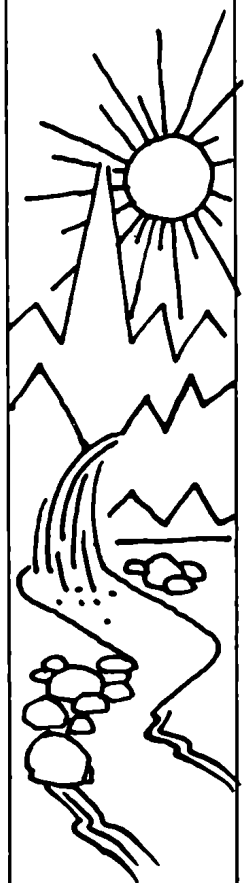

ঋষি হঠাৎ মাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে-কাঁদতে বলে উঠল, 'আকাশে কত পাখি, মা, আমার পাখি কই?'

স্কুলে ভূগোলের ক্লাসে জিতেনবাবু আগ্নেয়গিরির কথা পড়াচ্ছিলেন। ঋষির কানে একটা কথাও যাচ্ছিল না, সে মনে মনে দুটো শালিখের চ্যাঁ-চ্যাঁ শুনতে শুনতে ভাবছিল— আকাশ-বাতাসের কোনও প্রাণীকে আর কখনও আমি ঘরের মধ্যে আটকে রাখব না।

জিতেনবাবু হঠাৎ পড়া থামিয়ে হাতের বইটা মুড়ে ঋষির কাছে এসে বললেন, 'আগ্নেয়গিরি কাকে বলে?'

ঋষি অবাক হয়ে মাস্টারমশায়ের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'আগ্নেয়গিরি আমি তো দেখিনি। স্যার, পাখি মরে গিয়ে কি আবার পাখি হয়েই জন্মায়?'

জিতেনবাবু বরাবরই বেশ রাগী ও খিটখিটে মেজাজের মানুষ। ঋষিকে অন্যমনস্ক দেখেই তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, উত্তর শুনে রীতিমতো রেগে উঠতেও যাচ্ছিলেন, কিন্তু পাখির কথায় তাঁর ছেলের কথা মনে পড়ে গিয়ে তাঁর মন নরম হয়ে এল। ক'মাস আগে তাঁর ছেলে গঙ্গায় চান করতে গিয়ে বানে ভেসে গিয়েছিল, তাকে আর পাওয়া যায়নি। ঋষির কথা শুনে দু-এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'মরে গিয়ে কেউ আবার

জন্মায় কি-না কে বলতে পারে! আমি আগ্নেয়গিরি পড়াচ্ছি, একটু মন দিয়ে শোন বাবা।'

'স্যার, আগ্নেয়গিরি কি পাহাড়ে থাকে?'

'গিরি মানেই পাহাড়। যে পাহাড়ের ভেতরে আগুন, লাভা এইসব থাকে—'

ঋষির কী মনে পড়ে গেল, মাস্টারমশাইয়ের কথার মধ্যেই বলে উঠল, 'স্যার, আমি একদিন স্বপ্নে ঝরনা দেখেছি। ঝরনাও তো পাহাড়েই হয়!'

সেই থেকেই ঋষির মাথায় পাহাড়, ঝরনা, আগ্নেয়গিরি ঘুরতে থাকল। বিকেলে বাড়ি ফিরে সে অনেকক্ষণ খুব তন্ময় হয়ে পায়চারি করল। পরদিন, ছুটির দিন ঋষি সকাল থেকেই কাদা-মাটি নিয়ে ব্যস্ত।

ফুলবাগানের শেষে খানিকটা এবড়ো-খেবড়ো জমি, তারই একপাশে মাটি কুপিয়ে জল দিয়ে মেখে তাই দিয়ে পাহাড় বানাতে বসল। সূর্য মাথার ওপর উঠল, ঋষির সারা গা ঘামে-কাদায় মাখামাখি, কতবার যে বাড়ি থেকে খাবার তাগাদা দিয়ে গেল, মা এসে বকে গেলেন— কোনওদিকে তার হুঁশ নেই, শুধু একমনে সে পাহাড় বানায় আর মাঝে-মাঝে কাজ থামিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখে সত্যিকার পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছে কি-না। কাদার ওপর তাল-তাল কাদা চাপিয়ে যাচ্ছে, এখানে-ওখানে পাহাড়ের চুড়ো উঠছে— দেখতে দেখতে মূল চুড়ো

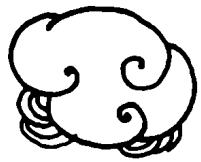

ঋষির মাথা ছাড়িয়ে গেল। ঝরনার জন্য পাহাড়ের গায়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নালি কাটা হল, ওপরে পিছন দিকে পুকুরের মতো করা হল, যেখান থেকে জল ঘুরপথে নেমে আসতে অনেক সময় নেবে। আগ্নেয়গিরির জন্য উনুনের মতো গর্ত করা হল, সেই গর্ত থেকে চুড়ো পর্যন্ত পাহাড় ফুঁড়ে সরু পথ উঠল এঁকে-বেঁকে— অনেকগুলো 'দ' একটার মাথায় আরেকটা চড়লে যেমন হয়, তেমনই।

সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। দূরে মস্ত বড় ধনুকের মতো বেঁকে চলে গেছে রেললাইন। রেললাইনের ওপারে গা-ঘেঁসাঘেঁসি গাছপালার আড়ালে ডুবে যেতে-যেতে একটুখানি থেমে রয়েছে পূর্ণিমার চাঁদের মতো সূর্য। গাছপালার মাথার ওপর আকাশ লালে-কমলায় দপদপ করছে।

ঋষি পাহাড়ের ওপরের গর্তে জল ঢেলে দিল, নিচের গর্তে শুকনো ডালপালা জ্বালিয়ে দিল। পাহাড়ের চুড়ো দিয়ে সরু হয়ে ধোঁয়া বেরুতে লাগল আর গা বেয়ে এঁকে বেঁকে খুব শীর্ণ ঝরনা নামল। ঋষি একটু দূরে সরে গিয়ে তার নিজের তৈরি পাহাড়, ঝরনা, আগ্নেয়গিরির দিকে চেয়ে রইল।

আকাশে তখনও একটুকরো সূর্যাস্ত লেগে রয়েছে। ঋষি দেখল পাহাড়ের বিচ্ছিরি ছায়া লম্বা হয়ে মাটিতে

শুয়ে পড়েছে, পাহাড়ের গায়ে— কোথায় ঝরনা— কাদাগোলা জল গড়াচ্ছে, আর ক্লাস নাইনের কালীচরণ সিগারেট খেয়ে মুখ দিয়ে যে-রকম ধোঁয়া বার করে, আগ্নেয়গিরিটা দেখাচ্ছে ঠিক সেই রকম।

আকাশে রঙের শেষ তাণ্ডবটুকু দেখতে-দেখতে তার স্বপ্নের ঝরনা মনে পড়ল। পায়ের কাছে একটা শাবল পড়েছিল, সেইটে তুলে নিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে ঋষি তার পাহাড়, ঝরনা, আগ্নেয়গিরি মাটিতে মিশিয়ে দিল। তারপর সন্ধের অন্ধকার পেরিয়ে ঘরে ফিরে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, পাহাড়, ঝরনা, আগ্নেয়গিরি এসব কী করে হয়?'

ঋষির বাবা ব্যবসার কাগজপত্র দেখছিলেন, মুখ তুলে ঋষির পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে বললেন, 'এ কী ভূতের মতো চেহারা করেছো! এখনও পড়তে বসোনি! এতক্ষণ ছিলে কোথায়?'

'তুমি আগে বলো পাহাড়ে ঝরনা কোথা থেকে আসে, কী করে আগ্নেয়গিরি হয়?'

'সেকথা পরে' বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমার সারা গায়ে এ-রকম অদ্ভুতভাবে কাদা লাগল কী করে? কোথায় গিয়েছিলে?'

ঋষি কী বলতে যাচ্ছিল, তার মা ছেলের খোঁজে এদিকেই আসছিলেন, গলা শুনে ঘরে ঢুকতেই ঋষির বাবা বললেন, 'এই ভূতটাকে চিনতে পারো?'

'আর বোলো না! এ-ছেলেকে নিয়ে যে আমি কী করব! হাড়-মাস ভাজা-ভাজা করে খেলে!'

ঋষি অপলক চোখে মাকে দেখল। তারপর ও-রকম চেয়ে থেকে বলল, 'মা, মাস মানে তো এখানে মাংস। খেলে মানে, আমি খেলাম। মা, তুমি ও-রকম করে কথা বলো কেন?'

'তা না-হয় বলব না। কিন্তু কী চেহারা করেছিস একবার দেখ তো আয়নায়। চ, তোকে আজ সাবান-কাচা করে ছাড়ব।'

মা তাকে বাথরুমের দিকে প্রায় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন।

বাথরুমের আয়নায় নিজেকে দেখে ঋষি অবাক হয়ে ভাবল, কী এমন হয়েছে! চাষীদের হাতে, পায়ে, নাকে, মাথার চুলে বুঝি কাদা লাগে না? কী হয় তাতে?

৩

দেখতে দেখতে শরৎকাল এসে পড়ল। আকাশ এত নীল হয়ে গেল যে দেখে ভাবাই যায় না অল্প কিছুদিন আগেও এর রং ছিল কখনও ঝামার মতো একটু-একটু অন্ধকার, কখনও ভুষো কালির মতো, কখনও-বা শকুনের ডানার মতো কেমন-কেমন। এখন নীল, শুধু নীল, কাচের গুলির মতো চকচকে নীল। আর সেই বিরাট নীলের মধ্যে রাজহাঁসের মতো মেঘের টুকরো চুপ করে ভেসে রয়েছে, এখানে-ওখানে।

ছাদের ভাঙা চিড়িয়াখানায় বসে ঋষি এইসব দেখছে, এমন সময় তার কানের ওপর কী-একটা সর-সর করে উঠতেই সে খপ করে সেটা ধরে ফেলল। দেখে, খুব লম্বা একটা সুতো, আকাশ থেকে ঝুলতে ঝুলতে চলে যাচ্ছে। সুতোটা ধরতেই সেটাতে টান পড়ল, ঋষি আকাশে চোখ তুলে দেখল অনেক উঁচুতে সুতোর ও-মাথায় একটা ঘুড়ি বাঁধা। ঘুড়িটা নিশ্চয়ই অনেক সুতোসুদ্ধ কেটে গিয়েছিল, ঋষিদের ছাদে সুতো লুটিয়ে এতক্ষণ হাওয়ায় চিৎ হয়ে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছিল, এখন ঋষির হাতে দিব্যি সোজা হয়ে উড়তে লাগল। আকাশের অনেক উঁচুতে স্থির হয়ে ভেসে-থাকা ছোট্ট চিলের মতো দেখাচ্ছিল ঘুড়িটাকে।

ঋষি ঘুড়ির মুখ এদিক-ওদিকে ঘুরিয়ে মেঘের টুকরো ছোঁয়ার চেষ্টা করল। না-পেরে সে ভাবল, আমার যদি অনেক সুতো থাকত, ঘুড়িটাকে অনেক উঁচুতে উড়িয়ে দেখতাম মেঘ কেমন ছোঁয়া না যায়!

আকাশের দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে শ্বেত পদ্মের মালার মতো বকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছিল। পাছে তার ঘুড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে কোনও বক ব্যথা পায়, তাই ঋষি সাবধানে ঘুড়িটাকে পশ্চিমে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল। কী করে কী হয়ে গেল, ঋষি দেখল, মালা থেকে ফুল

ছিঁড়ে পড়বার মতো একটা বক টাল খেতে-খেতে নিচে পড়ে যাচ্ছে! তার একটা ডানা কেটে গিয়ে কোনওরকমে গায়ের সঙ্গে ঝুলে রয়েছে। আরেকটা ডানা ঝাপটিয়ে প্রাণপণে ভেসে থাকবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

ঋষির বুকের মধ্যে হায়-হায় করতে লাগল। তবে কি তারই সুতোয় বকটার ডানা কাটা গেল। সূর্যের আলোয় কী করুণ ভাবে টলতে টলতে নেমে আসছে বকটা।

নামতে নামতে গ্রামের কিনারে তালগাছের সারির আড়ালে হারিয়ে গেল।

ওদিকটায় বেদেপাড়া। তালপাতার ছোট-ছোট খুপরি বানিয়ে কয়েক ঘর বেদে অনেকদিন থেকে ওখানে থাকে। ঋষি খরগোশের মতো দ্রুত নিচে নেমে বেদেপাড়ার দিকে ছুটতে শুরু করল। দুঃখে, উত্তেজনায় সে হাতের সুতো ছেড়ে দিয়েছিল, ঘুড়িটাও ভাসতে ভাসতে দূরে চলে গেল। সেদিকে মন নেই, সে হাঁপাতে হাঁপাতে বেদেপাড়ায় পৌঁছে দেখে, একটা খুপরির সামনের আঙিনায় বকটাকে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রাখা রয়েছে, রক্তে ঝুড়ির নিচের মাটি ভিজে গেছে, আর শ্বেত পদ্মের মতো ধবধবে বকটা রক্তে-ধুলোয় মাখামাখি হয়ে নেতিয়ে পড়ে ধুঁকছে।

ঝুড়িটার কাছেই চিমসে চেহারার একটা লোক ছোট একটা মাটির কলকে দু-হাতের মুঠোয় ধরে মুখে দিয়ে

জোরে-জোরে টানছিল আর নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া বার করছিল।

তার দু-চোখ বোজা। মনে হয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লোকটা কলকে টানছে। ঋষি কাছে গিয়ে জোর গলায় বলল, 'এই, শুনছো? আমি বকটাকে নিতে এসেছি।'

লোকটা অল্প একটু চোখ মেলল। ঋষি দেখল টকটকে লাল আকাশের মতো চোখ লোকটার। মানুষের চোখের ও-রকম রং দেখে ঋষির বুকের মধ্যে একটু শিরশির করে উঠল। সে তবু বলল, 'বকটা আমার। আমি নিতে এসেছি।'

ঋষির কথার উত্তর না দিয়ে লোকটা ধীরে-সুস্থে কলকেয় একটা লম্বা টান দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ধোঁয়া বার করল, তারপর ঢুলুঢুলু চোখে ঋষিকে খানিকক্ষণ দেখল, তারপর টেনে-টেনে বলল, 'সাপের মুখ থেকে ব্যাঙ নিতে এয়েছিস্! জানিস একেবারে স্বগ্‌গ থেকে মা-মনসা আমার মুখে এটা তুলে দিয়েছে!'

লোকটার ঠোঁটের কোণ বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ল। জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে খুপরির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'অ্যাই সোনালি। ছুরিটা নিয়ায় তো, জবাই করে ফেলি।' ঘরের ভেতর থেকে তক্ষুনি একটা ছুরি কে উঠোনে ছুড়ে দিল।

ঋষি ছটফট করে উঠে বলল, 'ওকে তোমরা কেটো

না। ওকে মা-মনসা পাঠায়নি, ওর বন্ধুদের সঙ্গে ও যাচ্ছিল, আমার ঘুড়ির সুতোয় ডানা কেটে পড়ে গেছে। আমাকে দাও, আমি ওকে সারিয়ে তুলব।'

লোকটার লাল চোখ কালীপুজোর ডাকিনী-যোগিনীর চোখের মতো জ্বলে উঠল। এক ঝটকায় একটা বেতের ঝাঁপির ঢাকনা খুলে কুণ্ডলী পাকানো একটা সাপের মাথায় টোকা মেরে ঋষিকে বলল, 'নিবি? নে—'

সাপটা ফোঁস করে বুকের ওপর ভর দিয়ে উঠে ফণা মেলে জিভ লকলক করতে লাগল। ঋষি লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল, তার সারা গায়ে কুলকুল করে ঘাম বইছে। ঋষি হাত জোড় করে কাতর স্বরে বলল, 'সাপ ফিরিয়ে নাও। সাপুড়ে-দাদা, তোমার ও-সাপ ফিরিয়ে নাও। তুমি আমাকে বক দাও, তার বদলে তুমি যা চাইবে আমি দেব।'

লোকটা কী ভেবে সাপটাকে ঝাঁপিতে পুরে ঢাকনা বন্ধ করল।

ঋষি তখনও হাত জোড় করেই দাঁড়িয়ে ছিল, তার ডান হাতের আঙুলের হীরের আংটিতে শরৎকাল চিকচিক করছিল। লোকটার লাল চোখ চকচক করে উঠল—হীরেটা ঝিলিক দিচ্ছে যেন অন্ধকারে সাপের মাথার মণি! বলল, 'মা-মনসা দেখছি তোকেই পাঠিয়েছে। ওই আংটিটা দিয়ে তোর বক তুই নিয়ে যা।'

ঋষি তক্ষুনি আংটি খুলে লোকটার হাতে দিয়ে দিল।

বকটা ঝুড়ির নিচে তখনও ধুঁকছে। ঋষি তুলতে যেতেই সে ভয়ে মাটির সঙ্গে আরও সেঁটে যেতে চাইল। ঋষি জোর করে, সাবধানে বকটাকে তুলে নিয়ে দু-হাতে বুকের ওপর আলতো চেপে ধরল।

কাটা ডানাটার গোড়া থেকে তখনও চুঁইয়ে-চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। ঋষি একটু ঝুঁকে মাথা দিয়ে রোদ আড়াল করে বকটাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে চলল। পিছন থেকে সেই লাল-চোখ বেদের গলা শোনা গেল, 'আংটির কথা, সাবধান, কাউকে বলবি না!'

ঋষির জামায় বকের রক্ত লেগেছিল, বক নিয়ে বাড়িতে ঢুকতেই মা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে বললেন, 'আবার এইসব!'

'না মা, পুষব না। আমার ঘুড়ির সুতোয় লেগে ডানা কেটে গেছে, আমি এটাকে সুস্থ করে ছেড়ে দেব।'

'আগের জন্মে তুই পাখি-টাখি ছিলি নাকি-রে! যা-কিছু হয় সব তোরই সঙ্গে! তোর এ-দশা ঘুচবে কবে!'

ঋষি কাতর স্বরে বলল, 'মা একে কী করে বাঁচাব? অনেক রক্ত পড়েছে, এক্ষুনি একজন ডাক্তার চাই।'

মা বললেন, 'ডাক্তার কী করবে? এসব পশুপাখির ডাক্তারের কাজ। এখানে পাবি কোথায়?'

বিপিনের মা গরুর জাবনা দিয়ে হাত-টাত ধুয়ে উঠোন পেরুচ্ছিল, সব দেখেশুনে বলল, 'ডাক্তার চাই না আরও

কিছু! এট্টু কপ্পুরগুঁড়ো আর ঢোলকলমি পাতার রস লাগিয়ে দাও দিকি। এই তো সেদিন শেয়ালে পাঁচুদের হাঁস নিয়ে যাচ্ছিল, তাড়া খেয়ে হাঁস ফেলে পালাল, কী রক্ত, কী রক্ত! কপ্পুর আর ঢোলকলমি লাগাতেই রক্ত পড়া বন্ধ। সেই হাঁস কেমন পুকুর সাঁতরে গুগলি খেয়ে বেড়াচ্ছে দ্যাখো গিয়ে।'

ঋষি বকটাকে নামিয়ে রেখে একছুটে গিয়ে ঢোলকলমি পাতা ছিঁড়ে আনল। পাতা ছেঁচে সেই রস বকের কাটা জায়গাটায় লাগিয়ে দিল। তারপর সেখানে বার কয়েক কর্পূরগুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে সত্যিই রক্ত পড়া বন্ধ হল। বিপিনের মা পাটের সরু সুতলি দিয়ে কাটা ডানাটা বকের বুকের সঙ্গে বেঁধে দিল। ঋষি গোয়ালে ঢুকে একটা গরুর বাঁট থেকে নারকোলের মালায় খানিকটা দুধ দুইয়ে বকের লম্বা ঠোঁটের সামনে তুলে ধরল। বকটা মুখ ফিরিয়ে নিতে ঋষিও সেইদিকে নারকোলের মালাটা এগিয়ে দিল, বক এবারও অন্য দিকে মুখ সরিয়ে নিল। বিপিনের মা উঠোনের তারে কাপড় মেলছিল, ঋষিকে ও-রকম করতে দেখে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'বক কখনও দুধ খায়?'

'বকের রং তো দুধের মতো, বক দুধ খায় না?'

'দুর! দাঁড়াও, ওর খাবার ব্যবস্থা করছি।' বলে

বিপিনের মা পুকুর থেকে গেঁড়ি শামুক আরেকটা গামছায় কতগুলো তেচোখা মাছ এনে বকের সামনে নামিয়ে দিল। বকটা এবার অনেক কষ্টে এক পা গুটিয়ে নিয়ে এক পায়ে দাঁড়াল, কয়েক মুহূর্ত অমনি থেকে সন্তর্পণে দু-পা ফেলে গেঁড়ি-শামুকের দিকে একটুখানি সরে এল। তারপর লম্বা গলা নাচের ছন্দের মতো দুলিয়ে দুলিয়ে ঠোঁট দিয়ে খুব কষ্ট করে ছোঁ মেরে তুলে নিতে লাগল একটার পর একটা গেঁড়ি, শামুক, তেচোখা মাছ।

ঋষির আর কোনওদিকে মন নেই, ঘুম থেকে উঠেই দৌড়ে যায় বকের খাঁচার কাছে, নিজে হাতে করে বককে খাওয়ায়, কাটা ডানায় আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে দেয়, সারা বিকেল ছাদের কোনায় বকটাকে বুকে নিয়ে টলটলে নীল আকাশের নিচে বসে থাকে।

দিন সাতেকের মধ্যে বকটা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। এখন সে দিব্যি খানিকটা উড়তে পারে। একবার তো ছাদের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত গলা বাড়িয়ে ডানা নাচিয়ে খুব সুন্দর ভঙ্গিতে উড়ে গেল।

পরদিন সকালে ঋষি খাতা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তাতে লিখল— আমার নাম ঋষিকুমার চৌধুরী। আমি ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলাম, সুতোয় লেগে এই বকটার ডানা কেটে গেল। বকটা বেদেপাড়ায় গিয়ে পড়ল। সেখানে

একটা লোক বকটাকে খাবে বলে ঝুড়ি-চাপা দিয়ে রেখেছিল। লোকটার চোখ টকটকে লাল। আমি তাকে আংটি দিয়ে বকটাকে বাড়ি নিয়ে আসি। তারপর তাকে সুস্থ করে তুলেছি। এ এখন সুন্দর উড়তে পারে। আমি আকাশে উড়িয়ে দিলাম। যদি কখনও তার বাঁদিকের ডানায় আবার ব্যথা হয়, উড়তে উড়তে যদি মাটিতে পড়ে যায়, তাহলে যে দেখতে পাবে সে যেন ওকে একটু সুস্থ করে আবার উড়ে যেতে দেয়। এর খাদ্য গেঁড়ি, শামুক ও কুচোমাছ।

লিখে, একবার পড়ে নিয়ে ঋষি কাগজটা সুতো দিয়ে আলতো ভাবে বকের পায়ে বেঁধে দিল। তারপর তাকে বুকে নিয়ে ছাদময় খুব অশান্ত ভাবে পায়চারি করতে লাগল। তারপর যখন ভীষণ নীল আকাশে ধবধবে শাদা আলপনার মতো একসারি বক উড়ে যাচ্ছে দেখতে পেল, তখন ঋষি বুক থেকে বকটাকে নামিয়ে দু-হাতে উঁচু করে ধরে ছেড়ে দিল। বকটা একবার একটু দূরে উড়ে যায়, আবার ঋষির মাথার ওপর ফিরে আসে, তার পায়ে-বাঁধা কাগজ হাওয়ায় ফরফর করে, এমনই করল সাতবার, তারপর খুব দূরের দিকে উড়ে গেল, যেদিকে শাদা আলপনার মতো বকের সারি আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছিল।

চেয়ে থাকতে থাকতে ঋষির হঠাৎ বুকের মধ্যে হু-হু

করে উঠল, সে দু-হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

কান্না শুনে মা দৌড়ে এলেন, ঋষিকে বুকের মধ্যে নিয়ে বললেন, 'ঋষি, ও ঋষি, কী হয়েছে তোর, বল আমাকে।'

বলবে কী, ঋষি শুধু কেঁদেই চলল। তার আঙুলে হঠাৎ চোখ পড়তেই মা বললেন, 'ওমা, তোর আংটি কই? কী করেছিস আংটি? বল, বাবা, বল। হারিয়েছিস তো? কোথায় ফেলেছিস? বল, ঋষি, বল। তোর বাবা জানতে পারলে আর আস্ত রাখবেন না। কাউকে দিয়ে দিসনি তো? কথা বল।'

ঋষি কাঁদতে কাঁদতে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বেদেপাড়ার একটা লোককে আংটিটা দিয়ে আমি বকটাকে এনেছিলাম। আমার বক কেন চলে গেল মা?'

'তার মানে, এতদিন তোর আঙুলে আংটিটা নেই! তোর ঠাকুমা মারা যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন সবসময় তোকে আংটিটা পরিয়ে রাখতে। তুই যা ছেলে, তোর বাবা কত বারণ করেছেন, তবু ওটা তোর আঙুল থেকে খুলে নিইনি। এখন কী উপায় হবে বল তো! তোর বাবাকেই বা বলব কী?'

ঋষিকে নিয়ে নিচে নেমে এসে ওর মা আর-কিছু ভেবে না পেয়ে দারোয়ানকে ডেকে পাঠালেন। ছোট্ট-খাট্ট মজবুত চেহারার নেপালি দারোয়ান সব শুনে বলল, 'আপনি কিছু ভাববেন না মাইজি। আংটি যদি এখনও বেদেটার কাছে থাকে, আমি ঠিক ফিরিয়ে আনব। খোকাবাবুকে আমার সঙ্গে দিন, লোকটাকে চিনিয়ে দিলে ভালো হয়।'

'না, না। ঋষির ওখানে গিয়ে কাজ নেই। ওর আবার কী ক্ষতি-টতি করে দেবে! তুমি ওর কাছ থেকে লোকটার চেহারা ভালো করে শুনে নাও। সঙ্গে আরও কজন লোক নিয়ে যেয়ো।'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দারোয়ান আংটি নিয়ে ফিরে এল। মাইজিকে আংটিটা দিয়ে বলল, 'ব্যাটা বলে কিনা কিসের আংটি, আংটি নেই। তারপর পুলিশের ভয় দেখাতেই সুর সুর করে বার করে দিল। খোকাবাবু মাঠ-ঘাটে ঘোরে, ওকে আর এটা পরাবেন না। এটা যে হীরের আংটি সেটা বেশ জানাজানি হয়ে গেছে।'

আংটি পেয়ে ঋষির মা প্রাণ ফিরে পেলেন। বললেন, 'পাগল! আর আমি ওটা বার করি! ছেলের প্রাণ নিয়েই শেষে টানাটানি পড়ুক আর কি!'

রাতে বিছানায় শুয়ে ঋষি দেখল, তার জানলায় সেই লালচোখ বেদেটা এসে দাঁড়িয়েছে। ঋষিকে দেখে অদ্ভুত ভাবে হেসে বলল, 'তুই দেখছি আমার থেকেও নীচ। জিনিস দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিস!'

'আমি ফিরিয়ে নিতে চাইনি। বিশ্বাস করো, আমি ওটা চাইনি' —বলতে বলতে ঋষি জানালার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, টেবিলের পায়ায় ঠোক্কর খেয়ে পড়ে গেল। সে কি ঘুমোচ্ছিল? বেদেটাকে কি স্বপ্নে দেখল? তা কী করে হবে, সে যে স্পষ্ট তার কথা শুনল। হয়তো একটু তন্দ্রা এসেছিল, তাই মনে হচ্ছে স্বপ্ন। এ কখনও স্বপ্ন হয়? সত্যিই তো সে আংটিটা দিয়ে আবার কেড়ে নিয়েছে।

৪

পরদিন সকাল থেকে ঋষি ছাদে ঘুরে ঘুরে সারা আকাশ খুঁজে বেড়াল— যদি তার বকটাকে কোথাও দেখা যায়। কোথায় বক! নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছে। তাকিয়ে তাকিয়ে তার চোখ ব্যথা করে উঠল, এমন সময় দূর আকাশের কোণে ঋষি দেখল যেন একটা চাঁদমালা ভেসে ভেসে এই দিকে আসছে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ঋষি নিশ্চিন্ত হল, বকের সারিই তো ওটা! পলকের জন্যও ঋষি ওই দৃশ্য থেকে চোখ সরালো না, বরং দৃষ্টি তীক্ষ্ণ

করে সে ওর মধ্যে তার বকটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল। বকের দল এক সময় ঋষির মাথার ওপর দিয়ে আকাশের আরেক দিকে উড়ে গেল। ঋষি খুব ভালো করে দেখল, কারও পায়েই কাগজ বাঁধা নেই। অসুস্থ বকটা তবে কি কোথাও পড়ে গেল? না-কি একদিনেই অন্য কোনও দেশে চলে গেল? সুস্থ থাকলে আর এদেশে থাকলে একবারও কি তার ঋষির কথা মনে পড়ত না!

এইসব ভাবছে, এমন সময় নিচের রাস্তা থেকে কে তার নাম ধরে ডাকল। ঋষি ঝুঁকে দেখে, ইসমাইল। গরুর গাড়িতে মাটির হাঁড়ি-কলসি বোঝাই করে চলেছে।

ইসমাইল ক-মাস আগেও তার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত। হঠাৎ তার বাবা মারা যাওয়ায় বাবার গরুর গাড়ি এখন তাকেই চালাতে হয়। গরুর গাড়িতে করে কুমোরদের হাঁড়ি-কলসি, চাষীদের আলু-কপি, ধান-পাট দূর-দূর হাটে পৌঁছে দেয়।

ঋষি বলল, 'ডাকলি কেন? —এই, শোন! তুই কি একটা পায়ে কাগজ-বাঁধা বক উড়ে যেতে দেখেছিস?'

'বক? না তো। —তুই সুয্যিপুর যাবি? আজ হাটবার। যাস তো চলে আয়।'

ঋষির মন নেচে উঠল। একে তো সুয্যিপুরের হাট দেখা হবে, তার ওপর বকটা যদি ওদিকে গিয়ে থাকে, দেখা হতেও পারে।

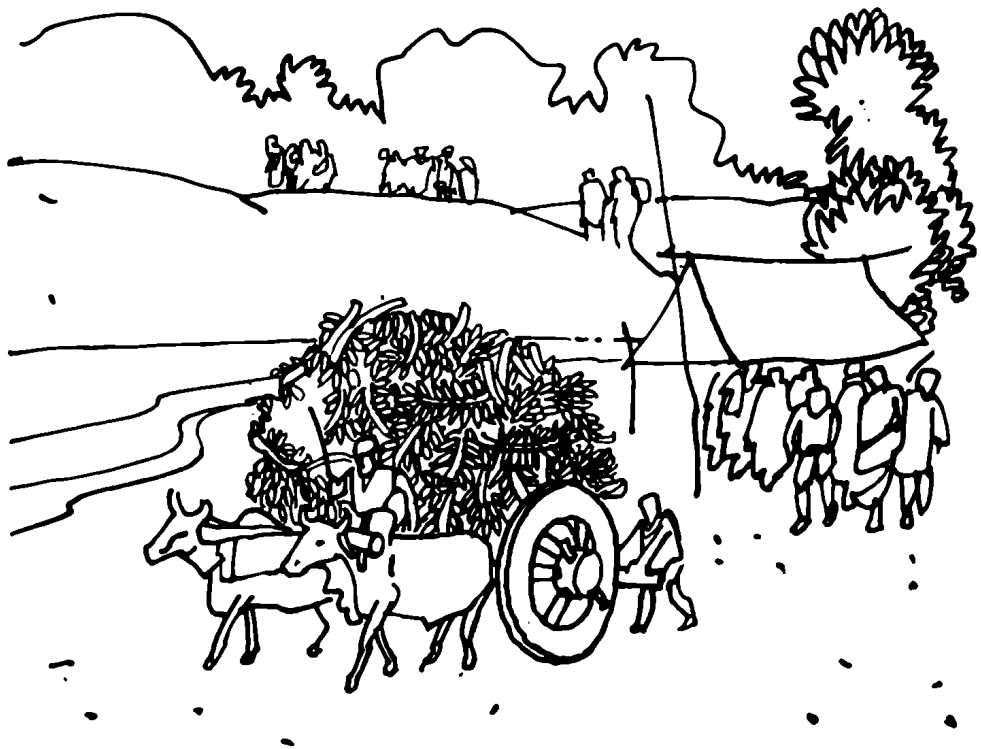

পথের দুপাশ কাশফুলে শাদা হয়ে আছে। শাদা রং ঋষিকে এখন কষ্ট দেয়। যত দেখে ততই তার বকের কথা মনে পড়ে যায়। মাথার ওপর দিয়ে পাখি উড়ে যাবার সামান্য শব্দ হলেই সে মুখ তুলে তাকায়। এ-পাখি, সে-পাখি, কতরকম পাখি উড়ে যায়, শুধু তার বকটাই কি আকাশ ভুলে গেল!

ইসমাইল বলল, 'তখন বকের কথা কী বলছিলি?'

ঋষি কাশফুল দেখতে দেখতে বলল, 'ও কিছু না। হাটের গুঞ্জন ভেসে আসছে— শোন।'

খানিক পরে তারা হাটে পৌঁছে গেল। ইসমাইল একটা তেঁতুলগাছের গুঁড়িতে গরু দুটোকে বেঁধে মাল নামাতে লাগল।

ঋষি বলল, 'আমি একটু ঘুরে দেখি, তারপর এখানেই ফিরে আসব। আমাকে না-নিয়ে চলে যাসনি যেন।'

হাট তো নয়, যেন মেলা বসেছে। ঋষি ঘুরে ঘুরে দেখছে, এমন সময় হাটের কোলাহলের মধ্যে কার বাঁশি শুনে সে এদিক-ওদিক বাঁশিওয়ালাকে খুঁজতে লাগল।

শাদা দাড়ি, ছেঁড়া-ময়লা আলখাল্লা পরা একটা বুড়ো লোক মাটির ঢিবির ওপর বসে চোখ বুজে বাঁশি বাজাচ্ছে, তার কাঁধের ঝোলায় অনেক বাঁশি।

এমন আশ্চর্য বাজায় লোকটা, যেন বাঁশির সুরে হাটের সব কোলাহল মুছে যাবে! শুনতে শুনতে ঋষি শব্দ না-করে কেঁদে ফেলল। বাঁশিওলার দাড়িতে রোদ পড়ছে। পৃথিবীতে এতরকম শাদাও আছে!

বাজানো শেষ করে লোকটা চোখ খুলল।

ঋষি কাছে গিয়ে চোখ মুছে বলল, 'আমি বাঁশি শিখতে চাই, আমাকে শেখাবে?'

'সব জিনিস নিজে শিখতে হয়। দেড়টাকা দাও, আর— এই নাও।' বলে বাঁশিওলা ঝোলা থেকে একটা বাঁশি বার করে ঋষির দিকে বাড়িয়ে দিল।

'ও নিয়ে আমি কী করব! আমি তোমার বাড়িতে তোমার সঙ্গে থাকব, তুমি আমাকে ওইরকম করে বাঁশি বাজাতে শেখাবে?'

বাঁশিওলা একদৃষ্টে ঋষির দিকে চেয়ে রইল, তারপর চোখের ইশারায় ঋষিকে তার সঙ্গে আসতে বলে ভিড় কাটিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

হাঁটছে তো হাঁটছেই, হাট ছাড়িয়ে, মাঠ ছাড়িয়ে, দোলতলা ছাড়িয়ে লোকটা একটা নির্জন পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে এই প্রথম পিছনে তাকাল। ঋষিকে দেখে বলল, 'আছিস তাহলে!' বলেই আবার হনহন করে হাঁটতে লাগল।

ঠিক যখন সন্ধে নামছে তখন গাছপালায় ঘেরা একটা কুঁড়েঘরের উঠোনে পৌঁছে লোকটা দ্বিতীয়বার পিছনে

তাকাল।

ঋষি একটু পিছিয়ে পড়েছিল, দ্রুত পা চালিয়ে কাছে আসতেই লোকটা আবার খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এলি তাহলে?'

দরজার তালা খুলে লোকটা তার মাটির ঘরে ঢুকে একটা কেরোসিনের কুপি জ্বালাল। তারপর খড়ের চালে গুঁজে-রাখা একটা সিল্কের আসন পেতে ঋষিকে বলল, 'বোস।'

আসনে বসে ঋষি বলল, 'এবার আমাকে বাঁশি শেখাও।'

'শেখাব। দাঁড়া, আমি একটু ভাবি।' বলে লোকটা মাটিতে চোখ বুজে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

কী এত ভাবছে, ভাবছে, না ঘুমোচ্ছে, ঋষি বুঝতে পারে না। কেরোসিনের কাঁপা আলোয় ঘরের অন্ধকার নাচছে। চুপ করে বসে থেকে থেকে ঋষি একসময় ক্লান্তিতে মাটিতে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল কে জানে, বাঁশিওলার ডাকে ধড়মড় করে ঋষি উঠে বসল।

লোকটা একটা কলাইয়ের থালায় গরম ধোঁয়া-ওঠা ভাত আর বেগুনপোড়া এগিয়ে দিয়ে ঋষিকে বলল, 'খেয়ে নে। তারপর তোকে বাঁশি শেখাব' বলে সে-ও

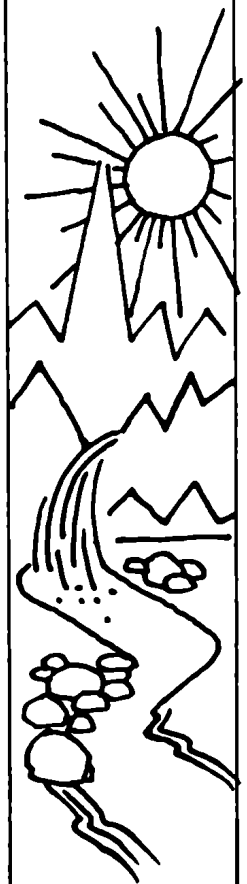

ভাতের মেটে হাঁড়ি টেনে নিয়ে খেতে শুরু করল। কখন লোকটা ভাত রেঁধেছে, বেগুন পুড়িয়েছে, ঋষি কিছুই জানে না। বলছে বটে বাঁশি শেখাবে, কিন্তু তার যে খুব একটা গরজ আছে— এমন তো মনে হচ্ছে না।

খেতে খেতেই লোকটা বলল, 'বাঁশি শুনতে শুনতে তখন কাঁদছিলি কেন? তুই কি কাউকে হারিয়েছিস?'

'আমার একটা অসুস্থ বককে রোজ খুঁজি, দেখতে পাই না। বকটার কথা মনে পড়লে আমার কষ্ট হয়। শাদা রং দেখলেই আমার বকটার কথা মনে পড়ে। কাশফুল দেখলে মনে পড়ে, তোমার ওই শাদা দাড়ি দেখেও মনে পড়েছিল।'

লোকটা খাওয়া থামিয়ে অদ্ভুত ভাবে ঋষির দিকে চেয়ে রইল।

ঋষি বলল, 'কখন আমাকে বাঁশি শেখাবে?'

লোকটা যেন এতক্ষণ ধ্যান করছিল, ধ্যান ভেঙে বলল, 'একটা বাঁশি তোকে দেব, তোর নিজের বাঁশি, নিজেই বাজাবি।'

'আমি তো বাঁশি বাজাতে জানি না।'

'তোর বাঁশি, তুই-ই বাজাবি।'

পরদিন ভোরে লোকটা ঋষিকে ঘুম থেকে তুলে দেয়ালের কুলুঙ্গি থেকে একটা পুরনো কঞ্চির কলম এনে

তার হাতে দিয়ে বলল, 'এই নে, এই তোর বাঁশি। বাড়ি গিয়ে যত খুশি বাজা।'

'এ তো কলমের মতো! এ আবার বাজে নাকি!'

'সকলের বাঁশি কি একরকম? এটা দিয়ে তুই তোর মনের কথা লিখবি। যা, বাড়ি যা।'

তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি, সবে দুটো-একটা পাখি ডাকতে আরম্ভ করেছে, তার মধ্যেই লোকটা ঋষিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। হাটের কাছে পৌঁছে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'দাঁড়া, তোকে শেষবারের মতো বাঁশি শোনাই। তোর বাড়ির পথ চিনিস তো?'

'হুঁ। ওই তো তেঁতুলতলা দিয়ে যেটা চলে গেছে, ওইটা।'

লোকটা চোখ বুজে বাঁশিতে সুর তুলল। সেই সুরে চারদিক কেমন করে উঠল! ঋষির মনে হল, সকালবেলার আকাশও আজ অন্যরকম দেখাচ্ছে।

বাঁশিওলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঋষি বাড়ির পথ ধরে হাঁটতে লাগল। আশপাশের গ্রামের মানুষ তখন সবে জাগতে শুরু করেছে, পথের ধুলোয়, ঘাসে শিশির চিকচিক করছে।

দীর্ঘ রাস্তায় একেবারে একা হাঁটতে হাঁটতে ঋষির হঠাৎ কিসের আনন্দে মন ভরে গেল, আর তখনই তার দুম করে মনে পড়ে গেল— সকালবেলার আকাশ আজ সেই বাঁশিওলার বাঁশির সুরের মতো।

বাড়ি পৌঁছে, কেউ তাকে কিছু বলবার আগেই ঋষি কঞ্চির কলমটা দেখিয়ে মাকে বলল, 'এই দেখো মা, আমার কলম।'